ইতিহাস এষণা ২
ISBN : 978-81-929386-6-0

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে চটকল শ্রমিকদের সামাজিক জীবনে বিবর্তনের ধারা ঃ সমীক্ষায় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭-২০১১)

শত্রুঘ্ন কাহার*

সারসংক্ষেপ ঃ ঊনবিংশ শতকে চটশিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। চটশিল্পে শ্রমিক জোগান দিতে দলে দলে লোক বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা থেকে বাংলায় ভিড় করতে থাকে। বিহার, উত্তরপ্রদেশের গ্রাম্য জীবন ছেড়ে, বাংলায় এসে এরা ঘিঞ্জিঅস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। চটকল শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চিত জীবন ও সামগ্রিক অসহায় অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছিল তাদের সামাজিক জীবন ও অভ্যাসে। জুয়া খেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি ছিল তাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিষয়। বাংলার এই চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে সর্দারদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। 'সর্দাররা শ্রমিকদের নিয়োগ করে ও আবার সরিয়ে দেয় বা বরখাস্ত করে। অনেকক্ষেত্রে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আবার বাসস্থান থেকে উৎখাত করে। এক কথায় বলতে হয় গ্রাম থেকে শহরে আসার পরও কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এদের জীবনের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল এই সর্দাররাই। তাদের গ্রামীণ জীবনের মুক্ত পরিবেশের চেয়ে এই জীবনের ব্যবধান ছিল বিস্তর। তবু বাঁচার তাগিদে তারা এই জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে। প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল তাদের বাংলাকে নিজ বাসস্থান ভাবতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাথে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে এই বাংলাই তাদের বাসস্থান, আবার অনেক শ্রমিক পরিবার তো দুই তিন প্রজন্ম থেকে তার আদি গ্রামের মুখ দেখে নি, তারা বাংলাকেই তাদের নিজ বাসস্থান বলে মনে করে।

সূচকশব্দ ঃ চটকল, সর্দার, যৌন পল্লী, যৌন অপরাধ, মহামারি, শ্রমিক শ্রেণী।

ঊনবিংশ শতকে চটশিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই চটশিল্পে শ্রমিক জোগান দিতে দলে দলে লোক বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা থেকে বাংলায় ভিড় করতে থাকে।[১] গ্রামের মুক্ত ও সুস্থ পরিবেশ থেকে কলকাতা শহরের ঘিঞ্জি-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে থাকে এই চটকল শ্রমজীবীরা। বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও, সামাজিক ক্ষেত্রে এরা ছিল বহিরাগত। বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সাথে এদের সমাজ সংস্কৃতির পার্থক্য ছিল বিস্তর। কিন্তু কালক্রমে এই চটকল শ্রমজীবীরা বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে এক সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের অংশ হতে থাকে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।

স্বাধীনতা-উত্তর এই চটকল শ্রমজীবীদের সামাজিক জীবনের বিবর্তনের ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলি হল যথাক্রমে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত প্রথম পর্ব, যখন তাদের প্রাক-স্বাধীনতা চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল, অর্থাৎ অর্ধকৃষক-অর্ধশ্রমিক চরিত্রের দ্বৈতসত্তা এপর্বেও সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০ এর সময়কালকে চিহ্নিত করা যায়। এপর্বে এদের চরিত্রের দ্বৈতসত্তার ক্রমশ অবসান ঘটতে থাকে এবং এরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দাতে রূপান্তরিত হতে থাকে। ১৯৯০ থেকে ২০১১ সময়কালকে তৃতীয় পর্ব রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সময় পর্বে বিশ্বায়নের কুপ্রভাবে চটকল শ্রমজীবীরা ক্রমশ মিলের সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী থেকে অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। স্বাধীনতা উত্তর চটকল শ্রমজীবীদের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার জন্য প্রাকস্বাধীনতা আমলে এদের সামাজিক জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা জরুরী। প্রাকস্বাধীনতা আমলে বাংলায় এদের জীবন কোনও নরককুণ্ড থেকে কম ছিল না। বিহার, উত্তরপ্রদেশের গ্রাম্য জীবন ছেড়ে, বাংলায় এসে এরা ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। মিলের তৈরি ছোট ছোট কোয়ার্টস বা মিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্দার নির্মিত অথবা বেসরকারি জমির মালিকদের তৈরি বস্তিতে এই শ্রমজীবীদের বসবাস করতে হত। এই সমস্ত বস্তিতে না ছিল পরিষ্কার জল সরবরাহের ব্যবস্থা, না ছিল সুস্থ পরিবেশ। বাসস্থানের দুঃসহ অবস্থা, মিলের হাড়ভাঙা খাটুনি, কাজের ঘৃণ্য পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর বস্তি জীবনের সাথে শ্রমিকদের জীবনে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ। বাৎসরিক ফ্যাক্টরি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মিল মালিকগণ শ্রমিকদের সাধারন স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন না। কেবলমাত্র কলেরা, টাইফইয়েড, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারির প্রকোপ দেখা দিলে তারা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। কারন তখন চটকলের উৎপাদন বিশেষ ভাবে ব্যাহত হত।[২]

চটকল শ্রমিকদের এই নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চিত জীবন ও সামগ্রিক অসহায় অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছিল তাদের সামাজিক জীবন ও অভ্যাসে। জুয়া খেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি ছিল তাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিষয়। উক্ত সময়কালে এই সমস্ত অঞ্চলে নারী-পুরুষের অনুপাতিক হারে ব্যাপক পার্থক্য, পুরুষ শ্রমিকদের প্রাধান্য, চটকল শ্রমিকদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করেছিল। যৌন অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। রয়্যাল কমিশন অন লেবারের সামনে শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মতামত জানাতে গিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টের ড. ব্যাটরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা থেকে যৌন অপরাধের মাত্রা যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা জানা যায়। ড. কার্জেল ১৯১২-২২ সালে বাংলার ৭৬ টি চটকল পরিদর্শন করে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায়, যে সকল অভিবাসী শ্রমিক, মাদ্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার চটকলে কাজ করতে এসেছিল তারা অধিকাংশই তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে এসেছিল। এই স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই চটকলে কাজ করত। এই অভিবাসী শ্রমিকরা প্রতিদিন রাতে যাদের সঙ্গে বসবাস করত তারা তদের স্ত্রী ছিল না।[৩]

অন্যদিকে বাংলার এই চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে সর্দারদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। 'সর্দাররা শ্রমিকদের নিয়োগ করে ও আবার সরিয়ে দেয় বা বরখাস্ত করে। অনেকক্ষেত্রে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আবার বাসস্থান থেকে উৎখাত করে।'[৪] এই অংশটুকু যে বিষয়টার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে তা হল শ্রমিকদের সামাজিক জীবনের ওপর সর্দারদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য। এক কথায় বলতে হয় গ্রাম থেকে শহরে আসার পর ও কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এদের

জীবনের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল এই সর্দাররাই, এমনকি বাংলার চটকলে কাজ পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্বেও থাকত এই সর্দাররা। তবে এসমস্ত কাজের বিনিময়ে শ্রমিকরা কাজ পেয়ে যাওয়ার পর সর্দারদের নিজ আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সর্দারদের উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করত যা একাধিক রয়্যাল কমিশন রিপোর্টে 'ঘুষ', 'ডালি', 'বখশিস', 'সালামি', 'পার্বণী' ইত্যাদি নামে পরিচিত।[৫]

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশভাগ এবং তার ফলে কাঁচামালের অভাব চটশিল্পকে পঙ্গু করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আধুনিকতার আঘাত। স্বাধীনতাউত্তর যুগে ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটায় এবং 'পলিমর', 'পলিব্যাগ' এর প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় চটশিল্পে নেমে আসে ভাঁটা।[৬] এর পাশাপাশি পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের সামাজিক জীবনের অভ্যাস ও আচার আচরণে।

তবে উল্লেখিত স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশক তাদের জীবনে পরিবর্তন ছিল ক্ষীন, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী লক্ষণগুলি মোটামুটি বজায় ছিল। এই পর্বের তাদের জীবনযাত্রার এক স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে সমরেশ বসুর উপন্যাস 'যুগ যুগ জীয়ে', ও 'বি. টি. রোডের ধারে' থেকে। মিলের পার্শ্ববর্তী শ্রমিক কোয়ার্টর্সগুলি (আয়তনে প্রায় ৮ ফুট বাই ৮ ফুট) পরিবারের সহিত থাকার জন্য উপযুক্ত ছিল না। অমল দাসের ভাষায় এগুলি ছিল শ্রমিকদের 'Sleeping room' বা রেস্ট রুম মাত্র।[৭] তাছাড়া মিলে নিযুক্ত প্রত্যেক অভিবাসী শ্রমিকের জন্য পৃথক কোয়ার্টর্স দেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার এই সময় থেকেই কিছু অভিবাসী শ্রমিক গ্রাম থেকে তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। উপরি উক্ত এসমস্ত কারণে চটকল মিলগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একাধিক বস্তি গড়ে ওঠে। এই বস্তিগুলির ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাদের জীবনে কোনো নরককুণ্ড থেকে কম ছিল না। এইপর্বে এই বস্তির ঘরগুলির আয়তন ছিল প্রায় ৮ ফুট ৮ ফুট, ঘেঁষ, চুন ও ইট দিয়ে তৈরি দেওয়াল ও ছাউনি হিসেবে খোলার বহুল প্রচলন ছিল। ঘরে বাতাস ঢোকার জন্য কোনো জানলা থাকত না। মেঝে ছিল মাটির এবং ঘরের পরিবেশ ছিল স্যাঁতসেঁতে।[৮] তাদের গ্রামীণ জীবনের মুক্ত পরিবেশের চেয়ে এই জীবনের ব্যবধান ছিল বিস্তর। তবু বাঁচার তাগিদে তারা এই জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে।

এইপর্বে তাদের সামাজিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ। এই সময় তাদের গ্রামীণ জীবনের খাদ্যাভ্যাসের সাথে এখানকার খাদ্যাভ্যাসের মিল ছিল লক্ষ্য করার মত। পূর্বেই বলা হয়েছে এরা সপরিবার এখানে বসবাস করত না, যদিও ৬০এর দশকের শেষের দিক থেকে বেশ কিছু শ্রমিক সপরিবার এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য মেসের ব্যবস্থা ছিল। এই মেসে খাবার খাওয়ার এক অভূতপূর্ব চিত্র পাওয়া যায় সমরেশ বসুর বি. টি. রোডের ধারে উপন্যাসে। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল রুটি জাতীয় খাবার যেমন বিভিন্ন ধরনের 'লিটি', 'মকওনি', 'আচার', 'আলুর চোখা', 'ছাতু', 'ভুট্টা', 'ছোলা', ভাত ইত্যাদি। তাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব ছিল লক্ষণীয়। এই বস্তিগুলির আসেপাশে একাধিক দেশী মদের ঠেক এবং মদ খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করার মত ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে এটি প্রচলিত ছিল। সমরেশ বসুর উপন্যাসে এবিষয়ে এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।[৯] পোশাক পরিচ্ছদ এর ক্ষেত্রেও এদের জীবনে গ্রামীণ প্রভাব একেবারে মুচ্ছে যায় নি। পুরুষরা ধুতি, গেঞ্জি, পাজামা, জামা ইত্যাদি ব্যবহার করত। কাঁধে থাকত সবসময় গামছা। মহিলারা প্রধানত শাড়িই পরিধান করত এবং সামান্য কিছু অলঙ্কার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বাংলার মানুষও ধুতি

পরিধান বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেও, এই আবাঙালী ও বাঙালীদের ধুতি পরিধানের 'স্টাইল' বা ধরন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র।[১০]

একদিকে চটকল বস্তিগুলোর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অন্যদিকে অপুষ্টিকর খাবার ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইসময় এদের জন্য না ছিল ই. এস. আই. এর ব্যবস্থা, না ছিল সরকারি সুলভ্য দাতব্যালয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগে আক্রান্ত শ্রমিকের গন্তব্য স্থল ছিল মৃত্যু। 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গণেশের স্ত্রী দুলারিকে এমনই এক রোগে আক্রান্ত হতে দেখি। আবার অন্য এক চরিত্র ফুলকি তো খুব অল্প বয়সেই রোগের প্রকোপে মারা যায়। অন্যদিকে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস না করায় এদের জীবন ছিল বিশৃঙ্খল যার প্রভাব পড়ে সামাজিক সম্পর্কের উপর। গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার দরুন জানা যায় বামপন্থী সরকার গঠনের প্রথম দিক পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলে বেশ্যালয় ছিল।[১১] মূলত এই চটকল অঞ্চলগুলিতে এক সময় বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল চটকল শ্রমিকদের সামাজিক জীবনে অস্থিরতার জন্য। সম্ভবত সপরিবারে এখানে বসবাস না করার দরুনই এ ধরনের অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে ইহা তাদের সামাজিক জীবনের একটি দিক মাত্র। তাদের সামাজিক জীবনে শুধুই অস্থিরতা ছিল একথা ভাবা ভুল। একটি সুস্থ সামাজিক সম্পর্কের ইঙ্গিতও মেলে 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দুলারি ও গনেশের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। যেখানে গণেশ তার স্ত্রী দুলারিকে এতই ভালোবাসে যে তার স্ত্রী দুলারি মরে গেলে তার জীবনে বেঁচে থাকার কোনও কারণ থাকবে না বলে সে অভিমত প্রকাশ করে। তার ভাষায় আর ও আজ মরতে বসেছে এখনে আমি কার উপর শোধ তুলব। কার উপর? তাই ভেবেছিলাম আমিও মরব... মরব ওর সঙ্গে।[১২]

চটকল শ্রমজীবীদের সামাজিক জীবনে বিবর্তনের দ্বিতীয় ধারা লক্ষ্য করা যায় মূলত ৭০ ও ৮০র দশক থেকে। এই সময় থেকে এই চটকল শ্রমিকদের দ্বৈতসত্তার অবসান ঘটতে থাকে বিভিন্ন কারণে যেমন দীর্ঘদিন বাংলায় থাকার দরুন চাষবাসের প্রতি অনীহা, গ্রামের চাষের জমির ওপর ক্রমশ ভাগিদারি বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে এরা সপরিবারে বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। অন্যদিকে বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি, বাংলায় এই শ্রমজীবীদের অধিকারকে নিরাপত্তা প্রদান এদের সামাজিক জীবনে স্থিরতা নিয়ে আসে।[১৩]

এই পর্বে যারা সপরিবার এখানে বসবাস করে তারা কোয়ার্টার্সের পরিবর্তে মিল নিকটবর্তী বস্তিতে আশ্রয় নেয়। তবে এই বস্তিগুলির চরিত্র বদলে যেতে থাকে। বস্তির ঘরগুলি তৈরিতে ঘেঁসচুনের বদলে সিমেন্ট বালি প্রয়োগ হতে থাকে। অন্তত দেওয়ালের বাইলের অংশে সিমেন্ট বালির প্রলেপ থাকত। মেঝে পাকা না হলেও ইট বিছিয়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে সিলিং করা হত। বস্তিগুলির পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা উন্নত করা হতে থাকে। বস্তিতে এক থেকে দুটো খাটা পায়খানা থাকত যা বস্তির সকলে ব্যবহার করত। স্থায়ীভাবে সপরিবার এখানে বাস করার জন্য একটি সংসারী জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস কিনতে শ্রমিকেরা বাধ্য হয়। যার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থায়ী বাজার ও দোকানপাটের বিস্তার ঘটে।[১৪]

সপরিবারে বসবাসের ফলে তাদের রান্নাঘরেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। যারা এখানে সপরিবারে থাকত না তাদের জন্য মেসের ব্যবস্থা তখনও ছিল, তবে ৮০দশকের শেষের দিকে এই মেস-এর জায়গা স্থানীয় ছোটো ছোটো ধাবা নিতে থাকে। অন্যদিকে সপরিবারে বসবাসকারী শ্রমিকদের

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন দেখা যায়। 'লিটি', 'মওকনি', স্থান নেয় রুটি এবং ভাত খাদ্য তালিকায় স্থায়ী জায়গা পায়। বিভিন্ন ধরনের ছাতু তখনও জনপ্রিয় ছিল। মাছ, মাংস ক্রমাগত তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় যদিও হপ্তা বা বেতনের দিনই এই প্রোটিন জাতীয় খাবার তাদের খাদ্য তালিকায় স্থান পেত। উক্ত সময়পর্বে বস্তি এলাকায় মদের ঠেকও বৃদ্ধি পায়। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বস্তি এলাকা ঘুরে দেখলে আজও এই দেশী মদের ঠেক নজরে পড়ে। মদ খাওয়ার প্রচলন পুরুষদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থ নারীরা মদ না খেলেও মিলে কর্মরত নারী বিশেষত যারা পরিবার ভুক্ত না থেকে একক জীবনযাপন করত তারা মদের নেশায় আসক্ত ছিল। তাদের পোষাকআষাকে বিরাট পরিবর্তন না এলেও পুরুষদের মধ্যে ধুতির চল ক্রমশ হ্রাস পায় এবং প্যাণ্টশার্টের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নারীদের পরিধানে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি স্থান নেয়।[১৫]

বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করায় সর্দারদের ওপর এদের নির্ভরতা ক্রমশ কমতে থাকে। অন্যদিকে রাজ্যে শ্রমিকদরদি বামপন্থী সরকার গঠনের ফলে এদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ধর্মঘট, আন্দোলনের মাধ্যমে ই. এস. আই. এর সুবিধা আদায় করা হয়। ফলে দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুর হার কিছুটা হলেও কমে। সপরিবারে বসবাসের ফলে সামাজিক জীবনেও স্থিরতা ফিরে আসে। যৌন অপরাধের মাত্রা কমতে থাকে। 'যৌন পল্লী' নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমিত হতে থাকে এবং সমাজে এক সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর খাবার খাদ্য তালিকায় স্থান পায়। ফলে অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর হার কমতে থাকে।

চটকল শ্রমজীবীদের সামাজিক জীবনে বিবর্তনের তৃতীয় ধারা লক্ষ্য করা যায় বিংশ শতকের শেষ ও একবিংশ শতকের প্রথম দশক অর্থাৎ ১৯৯০–২০১১ পর্যন্ত। এইপর্বে পরিবর্তনের গতি ছিল দ্রুত ও বৈচিত্র্যময়। প্রথম পর্বে শ্রমিকেরা সপরিবারে ভাড়া ঘরে বাস করলেও দ্বিতীয় পর্ব থেকে তাদের মধ্যে অনেকে এই বস্তি এলাকায় জমি ক্রয় করে নিজস্ব ঘর তৈরি করতে থাকে, তৃতীয় পর্বে এই মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।[১৬] এই সময় চটকল বস্তিগুলির চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়। ৯০দশকের মাঝামাঝি স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বামপন্থী সরকার বস্তিগুলি থেকে খাটা পায়খানাগুলি তুলে দেয়। বস্তিগুলি ক্রমে নগরের চরিত্র ধারণ করে, পয়ঃপ্রনালী উন্নত হয়। গারুলিয়া, ভাটপাড়া, নৈহাটি, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, টিটাগড় প্রভৃতি অঞ্চলে এই অবাঙালি চটকল শ্রমজীবীরা জমি ক্রয় করে স্থায়ী বসবাস করতে থাকে। এইপর্বে তাদের বসবাসের বাড়িঘর পূর্বের তুলনায় উন্নতর। দেওয়াল বালি–সিমেন্টে তৈরি, পাকা মেঝে, ছাওনি হিসেবে টালির ব্যবহার থাকলেও অ্যাসব্যাস্টর বা পাকা ছাদও নজরে পড়ে। উনিশ শতকের ৯০এর দশকের শেষের দিকে এদের ঘরে ঘরে টি.ভি, পাখা ও অন্যান্য বিনোদনের জিনিসপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক শ্রমজীবীদের বাড়িতে মোবাইল–এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১৭]

এদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও এইপর্বে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভাত ও রুটি প্রধান খাদ্যের তালিকায় স্থান পায়, ছাতু, ভূট্টা, লিটি, মকওনির প্রচলন প্রায় অবলুপ্ত হয়। মাছ–মাংস খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে এদের আর হপ্তার দিন বা বেতনের দিনের অপেক্ষা করতে হয় না। দেশী মদের পাশাপাশি বিদেশী মদের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এইপর্বে মদ খাওয়ার প্রচলন নারীদের মধ্যে আর লক্ষ্য করা যায় না। এর একটা কারণ হল চটকলগুলিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকা। অল্পবিস্তর যারা মিলে কাজ করত তাদের আর্থ–সামাজিক জীবনেও বিরাট পরিবর্তন

ঘটে। এদের পোষাক-আষাকেও স্থানীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের মধ্যে ধুতির প্রচলন প্রায় অবলুপ্ত হয়। যুবকযুবতিদের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। পুরুষদের পোষাকে প্যান্টশার্ট, জিনস্ এর আধিক্য নজরে পড়ে। মেয়েদের মধ্যেও শাড়ীর পাশাপাশি কূর্তি, পাজামা, চুড়িদার, জিনস্ ইত্যাদির প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ভোজপুরি লোকগীতি উল্লেখ করা যেতে পারে 'ফ্যাশন ম্যা আঁকে দুনিয়া ভুলানি জি' যেখানে তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।[১৮]

দুনিয়া ফৈশন মেঁ আইকে ভুলানী জী।
আঁখিয়া অজত উ লখাওয়ে ঢকনা।
ওকর মুহঁওয়া রুমাল সে পোছানী জী।
মুড়িয়া পর অপনা রখাওয়ে ঝোঁটওয়া।
ওকর আধী আধী মোছিয়া মুড়ানী জী।
পৈন্টওয়া কে ফন্দ মেঁ লগাওয়ে গোড়য়া।
লঘু সংকা কে বহাওয়ে ঠাঢ়ে পানী জী।
দুনিয়া ফৈশন মেঁ আইকে ভুলানী জী।

৯০এর দশক থেকে চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনের প্রভাব তাদের সামাজিক জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। এরা ক্রমে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে নিতে থাকে। বস্তিগুলি ক্রমে নগরে পরিণত হয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। নগরপালিকার দিক থেকে চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কম খরচে শ্রমিকেরা সেবা পায়। তবে এত সত্ত্বেও উক্ত অঞ্চলে শ্রমিকরা বিভিন্ন রোগের আক্রান্ত থাকতে দেখা যায়। চটকল শ্রমিকদের প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যক্ষা রোগে আক্রান্ত থাকতে দেখা যায়।[১৯] ই. এস. আই. এর পক্ষ থেকে বেলুর এ যক্ষা রোগের জন্য এক বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বাংলায় বসবাস করায় তাদের উৎশৃঙ্খল জীবন অনেকটা স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে। যৌন অপরাধ কমেছে। এই চটকল অঞ্চলগুলি থেকে দূরে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় বেশ্যালয় নজরে এলেও, বস্তি অঞ্চলে তা অনুপস্থিত।[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতাউত্তর পর্বে চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের যে স্থবিরতা ছিল তা ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে। প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল তাদের বাংলাকে নিজ বাসস্থান ভাবতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাথে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে এই বাংলাই তাদের বাসস্থান, আবার অনেক শ্রমিক পরিবার তো দুই তিন প্রজন্ম থেকে তার আদি গ্রামের মুখ দেখে নি, তারা বাংলাকেই তাদের নিজ বাসস্থান বলে মনে করে।

সূত্রনির্দেশ

১। B. Foli, *Report on Labour in Bengal*, Kolkata, 1906.

২। অমল দাস, বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ এর দশক থেকে ১৯২০ র দশক), *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, নির্বাণ বসু(সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১১৫।

৩। *কমার্স ডিপার্টমেন্ট কমার্স ব্রাঞ্চ*, নং বি ৭৭, এপ্রিল ১৯২৩।

৪। *Royal Commission on Labour in India*, Vol. 5, Part-1, London, 1931, p. 153.

৫। অমল দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

৬। A. Joshi and V. K. Goel, *Working Paper No. 40, Indian Jute Industry and Trends in the*

Exports of Jute Manufacturers, Giri Institute of Development Studies, Lucknow, undated, p. 1.

৭। অমল দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৮। সমরেশ বসু, *বি. টি. রোডের ধারে*, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৫৩, কলিকাতা, পৃ.পৃ. ২৫-২৬।

৯। সমরেশ বসু, তদেব, পৃ.পৃ. ১৯-২১।

১০। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ-০৫-০৪-২০১৭।

১১। সাক্ষাৎকার নিমাই সাহা, ফ.ব. কাউন্সিলর, বয়স-৬৫, তারিখ ০৫-০৪-২০১৭।

১২। সমরেশ বসু, তদেব, পৃ. ৫৮।

১৩। Nandini Gooptu, Economic Liberalisation, Work and Democracy Industrial Decline and Urban Politics in Kolkata, *Economic and Political Weekly*, May 26, 2007, page-1924.

১৪। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ-০৫০৪২০১৭।

১৫। সাক্ষাৎকার-অঞ্জু দেবী, ওয়েভেলি জুট মিলে কর্মরত, গারুলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স ৪১, তারিখ-০৬-১০-২০১৬।

১৬। *Jute Mill Workers of West Bengal A Situational Analysis towards Enhancing Their Wellbeing*, Riddhi Foundation. 2015-16, Study Sponsored by National Jute Board, p. 36.

১৭। Ibid, p. 63.

১৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ-০৫০৪২০১৭। রামবহাল তেওয়ারী, *ভোজপুরি সাহিত্যের ইতিহাস*, সাহিত্যালোক, কলকাতা ২০১৬, পৃ. ২২৬।

১৯। *Jute Mill Workers of West Bengal A Situational Analysis towards Enhancing Their Wellbeing*, Riddhi Foundation. 2015-16, Study Sponsored by National Jute Board, p. 54।

২০। ক্ষেত্রসমীক্ষা, ব্যারাকপুর, জগদ্দল, গারুলিয়া তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ-০৬-০৫-১৭।